২৭-০১-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভক্তেদের জীবনে যখন চরম ঝড়-ঝঞ্ঝা, আপদ-বিপদ আসে, তখনই বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন, যাতে তারা দুর্গতি থেকে সদ্গতি পেতে পারে।

প্রশ্ন :- বিকর্মাজীৎ কে হতে পারে ? বিকর্মাজীৎ হতে গেলে কি কি লক্ষ্মণগুলি থাকতে হবে ?

উত্তর :- বিকর্মাজীৎ সে হতে পারে, যে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি-প্রকৃতি জেনে শ্রেষ্ঠ কর্ম করে। বিকর্মাজীৎ হওয়ার লক্ষ্যধারীরা কোনও কর্মেই অনুচিত কিছু করে না। তাই তার কর্মগুলিও বিকর্ম হয় না।

প্রশ্ন:- এই সময়কালে বাবা স্বয়ং কি এমন ডবল সার্ভিস করেন ?

উত্তর :- একই সাথে আত্মা আর শরীর - উভয়কেই পবিত্র বানাবার এবং সাথে করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার। একত্রে এমন দুই চরিত্র একমাত্র বাবারই আছে, যা কোনও মনুষ্যের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

গীত:- ওঁম্ নমঃ শিবায়ঃ .....

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, ভক্তি-মার্গের এই গীত তো বহুকাল যাবৎ শুনে আসছ। ভক্তি-মার্গের গীতগুলি এমনই। তমসাচ্ছন্ন অন্ধকারকে কাটিয়ে আলোর দিশা চায় গীতকারেরা। লোকেরা দুঃখ-কষ্ট থেকে নিস্তার পাবার জন্য পরমাত্মাকে ডাকতে থাকে। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা তো হলে শিব-বংশী ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। এটাই মূল বোঝার ব্যাপার। গর্ভে ধারণ করে এত অধিক সংখ্যায় বাচ্চা তো আর কারও হতে পারে না। তাই অবশ্যই তারা মুখ-বংশাবলী দত্তক সন্তানই হবে। কৃষ্ণেরও এত রাণী কিম্বা এত অধিক বাচ্চা ছিল না মোটেই। একমাত্র গীতার ভগবানই কিন্তু রাজযোগ শেখান। তাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই বাচ্চারা মুখ-বংশাবলীই হবে। 'প্রজাপিতা' শব্দটিরও যথার্থ তাৎপর্য্য ও গুরুত্ব আছে। বাবা এসে এনার মুখ-কমল দ্বারাই ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা রচেন। তাই 'প্রজাপিতা' শব্দটি কেবলমাত্র ব্রহ্মাবাবার ক্ষেত্রেই শোভা পায়। বাস্তবে তোমরাও এখন সেই বাবারই সন্তান হিসাবেই পরিগনিত হও। জগতের লোকেরা তো অজ্ঞানতা বশে বলে ফেলে কৃষ্ণও যেমন ভগবান ছিলেন, শিবও তেমনি ভগবান। শিব অর্থাৎ রুদ্র ভগবানের বদলে অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রে কৃষ্ণের নামও জুড়ে দিয়েছে। অথচ তারাই আবার বলে শংকর-পার্বতী। কিন্তু প্রকৃত যা হবে তা - 'রুদ্র-পার্বতী'। অথচ তারা তা বলে না। এমন কি তারা শিব-শংকরকেও মহাদেব বলে থাকে। এখানে তবে কৃষ্ণের নাম আসে কিভাবে ? কৃষ্ণকে তো আর রুদ্র বা শংকর বলা চলে না। ভক্তরা এমনই গায়ন-কীর্তন করে। তারা অবশ্য প্রকৃত ভগবানকেই জানে না। ভারত ভূখন্ডে বাস্তবে তারাই প্রকৃত-ভক্ত, যারা একদা পূজ্য ছিল, কালের গতিতে এখন পূজারী। এতেও আবার তাদের ক্রমিক পদ-মার্যদা রয়েছে। যেমন তোমাদের বি.কে-দের মধ্যেও ক্রমিক পদ-মার্যদা রয়েছে। কিন্তু তোমাদের সাথে তাদের পার্থক্য হল, তোমরা ব্রাহ্মণ আর তারা শূদ্র। দেবতা ধর্মের আত্মারাই বেশী দুঃখী হয়। যেহেতু একদা তারাই সর্বাধিক সুখ ভোগ করেছে। এখন অবশ্য অর্দ্ধ-কল্পের জন্য তোমাদের এদিক-ওদিক মন্দিরের দোরে-দোরে ঘোরা বন্ধ হয়েছে। এই রহস্য কেবল তোমরা বি.কে.ব্রাহ্মণেরাই জানতে

পারো, তাও অবশ্য ক্রমিক নম্বর অনুসারেই। কল্প-পূর্বে যে যেমন পুরুষার্থ করেছিল, এখনও সে তেমনই করে চলেছে। কিন্তু এমন বলা যাবে না মোটেই, ড্রামা অনুসারেই তা করছে। তা হলে পুরুষার্থের নামটাই বা কেন এল। অবশ্য ড্রামা অনুসারে বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ তো করতেই হয়। যার যেমন পুরুষার্থ - তার তেমনই পদের প্রাপ্তি। তোমরা বি.কে-রা জানো, কল্প-পূর্বেও ঠিক এই নিয়মেই, এ ভাবেই পুরুষার্থ করেছিলে। কল্পপূর্বে ঠিক এমনটি ঘটেছিল, আর সেই যজ্ঞেও এমনই বিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছিল।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানতে পেরেছো যে, এই সময়ে বাবা এখন আবার এই ধরায় এসে অবতীর্ণ হয়েছেন। কল্প পূর্বেও ঠিক এমন (সঙ্গম) সময়েই এসেছিলেন, তখনও এমনই ইংরেজদের রাজত্ব ছিল। যাদের থেকে কংগ্রেসীরা রাজত্ব নিয়েছিল, আবার এমন ভাবেই পাকিস্থানেরও গঠন হয়েছিল। এখনও ঠিক তাই ঘটে চলেছে - যা কল্প-পূর্বেও ঘটেছিল। কিন্তু গীতায় এসব কিছুই লেখা নেই। অথচ, এটাই বুঝতে হবে যে, সর্বদাই তেমনটাই ঘটে চলেছে - যা কল্প-পূর্বেও ঠিক এই সময়কালে যা ঘটেছিল। অবশ্য কেউ কেউ তা অনুধাবন করে ঈশ্বর এখন এই ধরাতেই উপস্থিত আছেন। (কল্প পূর্বেও) যখন মহামারী লড়াই শুরু হয়েছিল, সেই সময়েও ভগবান এই ধরাতেই ছিলেন, কেবলমাত্র তার নামের বদল হয়েছিল - লোকেরাও এমনটাই বলে থাকে। রুদ্র নাম নিলে তবেই তা সঠিক বলে গণ্য হয়। যেহেতু রুদ্রই তো এই জ্ঞান-যজ্ঞের রচয়িতা। যার দ্বারা দুনিয়ার সব আপদ-বিপদ কেটে যায়। এই কথার সত্যতাও ধীরে ধীরে প্রমাণিত হবে, তোমাদের কার্য-করণের দ্বারা। যা এখনও আরও কিছু সময় লাগবে। না হলে এখানে এমন ভীড় শুরু হবে, যে কারণে তোমাদের পড়াশুনার বিঘ্ন ঘটবে। এখানে ভীড় বাড়ানোটা উদ্দেশ্য নয় মোটেই। গুপ্ত রূপেই সব কর্মকাণ্ড চালাতে হবে। কিন্তু যদি কোনও বিশেষ কেউ, বিদ্বান বা ধনী ব্যক্তি এখানে আসে, এসব দেখে সে আশ্চর্যই হয়ে যাবে। কিভাবে এখানে বাবা তার বাচ্চাদেরকে পাঠের অনুশীলন করান, তা দেখে। দেবতা ধর্মের রচনা তো স্বয়ং ভগবান এসে তা করান। উনি এখন এসেছেন নতুন দুনিয়া রচনার লক্ষ্যে। এত ভক্তের আপদ-বিপদকে দূর করতে। বিনাশের পর আর কোনও দুঃখই থাকে না। সত্যযুগে কোনও ভক্তও থাকে না। কেউ এমন কোনও কর্মও করে না, যা দুঃখের কারণ হতে পারে।

(বোম্বে থেকে রমেশ ভাইয়ের ফোন এসেছে) বাপদাদা সেখান থেকে চলে আসাতে বাচ্চাদের মন উদাস হয়ে পড়ে। যেমন, পতি যদি বিদেশে অর্থাৎ বিলেতে চলে যায়, তখন তার স্ত্রীর মনে বিষাদে কান্না আসে, তেমনই। তা কেবলমাত্র জাগতিক সম্বন্ধ মাত্র। কিন্তু এখানে তো বাবার সাথে বাচ্চাদের রুহানী (ঈশ্বরীয়) সম্বন্ধ। তাই বাবার বিচ্ছেদে প্রেমের-অশ্রু বেড়িয়ে আসে। যে সেবাধারী বাচ্চা হয়, তার কদর তো করতেই হবে বাবাকে। আবার সপুত (প্রকৃত পুত্র) বাচ্চাও তেমনি বাবার কদর করে। যেখানে এমন উচ্চ থেকে অতি উচ্চ, সর্বোচ্চ বাবার সাথে যাদের এত উচ্চ সম্বন্ধ। এর থেকে উচ্চ সম্বন্ধ আর কোনও সম্বন্ধই হয় না। শিববাবা তো চান তার বাচ্চাদেরকে নিজের থেকে আরও উচ্চ বানাতে। বাবা বলছেন- বাচ্চারা, যদিও তোমরাও তেমনই পবিত্র হও, কিন্তু বাপদাদার মতন চির-পবিত্র হতে পারো না। অবশ্য তোমরাই পরে পবিত্র দেবতা হও। এই বাবা তো জ্ঞানের সাগর। বাচ্চারা যতই জ্ঞান শুনুক না কেন, তবুও জ্ঞান-সাগর হতে পারে না। বাবা যেমন জ্ঞানের সাগর, তেমনি আবার আনন্দের সাগরও। ফলে বাচ্চাদেরকে এত আনন্দময় বানান তিনি। আর সেই অনুসারেই নামও রাখেন তিনি। বর্তমান সময়কালে সমগ্র দুনিয়াতেই ভক্তদের মালা (লিস্ট) খুব

বড় আকারের হয়ে আছে। কিন্তু তোমাদের (জ্ঞান-মার্গের) মালা তো কেবল ১৬,১০৮-এর, যেখানে ভক্তদের হয় কোটি-কোটি। এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ে ভক্তির কোনও ব্যাপারই নেই। যেহেতু প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারাই তো মানুষের সদগতি হয়। আর এখানে তোমাদেেরকে ভক্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা হয়। বাবা জানাচ্ছেন, যখন ভক্তদের ভীড় অনেক বেড়ে যায়, তখনই ওনাকে এই দুনিয়ায় আসতে হয়, সবারই সদগতি করার জন্য। স্বর্গ-রাজ্যের দেবতারা অবশ্যই এমন কোনও কর্ম করে, যার ফলে এত উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারে। মনুষ্যকে কর্ম তো অবশ্যই করতে হয়। কিন্তু সেই কর্ম এমন হওয়া উচিত, যা কোনও কারণেই তা যেন বিকর্ম না হয়ে যায়। বর্তমানের দুনিয়াতে অবশ্য সব কর্মই বিকর্মে পরিনত হয়, মায়ার কারণে। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যে মায়ার অবস্থান নেই। তাই সেখানে তোমরা বিকর্মাজীৎ হতে পারো। যেসব বাচ্চারা খুব ভালভাবে কর্ম-অকর্ম আর বিকর্মের গতি-প্রকৃতিকে ভালভাবে আয়ত্ব করে তা প্রয়োগ করতে পারে, একমাত্র তারাই বিকর্মাজীৎ হতে পারে।

বাচ্চারা, কল্প পূর্বেও তোমদেরকে এই রাজযোগ শেখানো হয়েছিল, যা এখন আবার শেখানো হচ্ছে। কংগ্রেসীরা ইংরেজদেরকে ভাগিয়ে দিয়ে রাজত্ব কেড়ে নিয়েছে, ফলে ইংরেজদের রাজাদের নামও এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে এই ভারত ভূ-খণ্ডই ছিল রাজস্থান অর্থাৎ রাজাদের স্থান। (সত্যযুগে) এখানেই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। যেহেতু তা ছিল দেবতাদের রাজ্য, তাই তা দেখতেও ছিল পরী-স্থানের মতন। সেই লক্ষ্মী-নারায়ণকেও অবশ্যই এই ভগবানই রাজযোগ শিখিয়ে থাকবেন। তাই তো তাদের এত সুন্দর নাম হয়েছিল, ভগবান-ভগবতী। কিন্তু এখন আমাদের এই শব্দের জ্ঞান হওয়াতে তাদেরকে আর ভগবান-ভগবতী বলব না অবশ্যই। এমনিতে তো সেই স্বর্গ-রাজ্যে যেমন সুখী রাজা-রাণী, তেমনই সুখী প্রজারাও। সে হিসাবে অবশ্য ভগবান-ভগবতী-ই বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে তো আর তেমনটা হতে পারে না। যেমন প্রজাদের মধ্যে কেউ লক্ষ্মী-নারায়ণ নামকরণ করতে পারে না। যা স্বর্গ-রাজ্যের নিয়মের পরিপন্থী। জাগতিক দুনিয়ায়, যেমন বিলেতেও কোনও প্রজা রাজার নামে নিজেদের পরিবারে কারও নাম রাখতে পারে না। যেহেতু রাজপদ অতি সন্মানীয় পদ, আর প্রজারাও রাজাকে যথেষ্ট সন্মান করে। বাচ্চারা কিন্তু অবশ্যই বুঝতে পারে গত ৫-হাজার বর্ষ পূর্বেও এভাবেই এই বাবা এসেছিলেন। এখনও আবার বাবা এসেছেন দৈবী-রাজস্থান স্থাপনের লক্ষ্যে। প্রতি কল্পেই শিববাবা স্বয়ং আসেন, ঠিক এই সময় কালেই। উনিই বি.কে. অর্থাৎ পাণ্ডবদের পতি। তা কিন্তু কৃষ্ণ নয় মোটেই। বাবা স্বয়ং পাণ্ডা হয়ে এসেছেন, দিশা দেখিয়ে বাচ্চাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ও নতুন সত্যযুগ স্থাপনার লক্ষ্যে। অতএব তা করতে অবশ্যই ব্রহ্মা দ্বারাই ব্রহ্মণদের রচনা করাবেন। যে কাজ কৃষ্ণের দ্বারা সম্ভব নয় মোটেই। অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা মুখ্য গীতাকেই তো খণ্ডন করে দিয়েছে। তাই বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, উনি যেখানে কৃষ্ণ নন, তাই ওনাকে রুদ্র বা সোমনাথ বলা যেতে পারে। যেহেতু উনি বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের সোমরস পান করান। কিন্তু এর জন্য কোনও লড়াই-ঝগড়ার প্রয়োজন পড়ে না। বি.কে. বাচ্চাদের যোগবলের দ্বারাই মাখন-মালাই-এর মতন স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্ব করায়ত্ব করা যায়। এতে অবশ্য কৃষ্ণেরও মাখন প্রাপ্তি ঘটে। এই কল্পে বর্তমানের এই জন্মই কৃষ্ণের আত্মার অন্তিম জন্ম। ব্রহ্মা আর সরস্বতীকে বাবা এমন সব কর্ম শিখিয়ে চলেছেন, যাতে করে ওনারাই আগামী ভবিষ্যতে লক্ষ্মী-নারয়ণ হতে পারেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণই শৈশবে হন রাধা-কৃষ্ণ। তাই তো লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের মধ্যেই রাধা-কৃষ্ণের চিত্রও দেখানো হয়। এছাড়া এর আর কোনও মাহাত্ব্যই নেই। আসল চরিত্র তো হল এক ও একমাত্র গীতার ভগবানের।

শিববাবা বাচ্চাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিভিন্ন ভাবে সাক্ষাৎকারও করান। যেহেতু তিনি কোনও মনুষ্য দেহধারীর চরিত্র নয়। যীশুখ্রীস্ট ইত্যাদিরাও এই দুনিয়ায় এসে জন্ম গ্রহন করে ধর্ম স্থাপন করেন। এসব আসলে তাদের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট, যেমনটি খোঁদিত আছে অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটে। ঠিক তেমনই সবাই কেবলমাত্র যে যার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট-ই করে থাকে। ফলে এখানে চরিত্রের কোনও ব্যাপারই নেই। একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ-ই কারও কোনও প্রকার গতি করতে পারে না। এখন বেহদের বাবা এসে বলছেন, উনি বাচ্চাদের প্রতি ডবল সার্ভিস করতেই এসেছেন। যার দ্বারা বাচ্চাদের আত্মা ও শরীর উভয়ই পবিত্র হয়ে যাবে। এখনই তো সবাইকে ঘরে অর্থাৎ মুক্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেখান থেকে আবার যে যার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতে আসবে (ড্রামার নিয়ম অনুসারে)। কত সুন্দর রীতিতে এমন সহজ-সরল ভাবে বাবা তার বাচ্চাদেরকে এসব বুঝিয়ে থাকেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখিয়ে এমন ভাবে বোঝানো খুবই সহজ ব্যাপার। তার সাথে ত্রিমূর্তি আর শিববাবার চিত্রও রাখা উচিত। চিত্রের প্রসঙ্গে কারও কারও মত যে, ত্রিমূর্তির চিত্রটি এমন ভাবে না হলেই ভাল হয়, তেমনই কেউ কেউ বলে যে, কৃষ্ণের চিত্রে কৃষ্ণের ৮৪-জন্মের কাহিনী না দেওয়াই ভাল, যেহেতু মানুষেরা যখন শোনে যে, কৃষ্ণও ৮৪-জন্ম নিতে গিয়ে পতিত হয়ে পড়ে, তখন তাদের মনে ভয়-ভীতি, দ্বিধা-দ্বন্দের সৃষ্টি হয়। যদিও বি.কে.-রা তা প্রমাণ করে দেখায়, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকেই সবার চাইতে বেশী জন্ম নিতে হয়। এরকম নতুন নতুন পয়েন্টস্ তো রোজই আসতে থাকবে, যার জন্য বাচ্চাদের খুব ভাল ধারণা থাকা দরকার। সব চাইতে সহজ হলো লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রকে বোঝানো। সেভাবে বুঝিয়ে না দিলে, মানুষেরা তো সেই সব চিত্রের প্রকৃত অর্থ বুঝতেই পারবে না। চিত্রকারদেরও সেভাবে বোঝাতে না পারলে তারা তো উল্টো-পাল্টা চিত্রই বানিয়ে দেবে। অজ্ঞানী চিত্রকারেরা এমনও কিছু চিত্র বানায় যে, নারায়ণের দু-হাত আর লক্ষ্মীর চার-হাত। কিন্তু সত্যযুগে তো এত বেশী অর্থাৎ চার-হাত হয় না কারও। যারা সূক্ষ্মবতনে থাকেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর, তাদেরও এত হাত থাকে না। আর মূলবতনে তো থাকে নিরাকারী পরমাত্মা ও আত্মারা। তবে এই ৮-হাত, ১০-হাতের এরা কোন বতনের অধিবাসী ? মনুষ্য সৃষ্টির প্রথম পর্যায়েই তো লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাদের মাত্র দুটি করে হাত। কিন্তু অজ্ঞানী চিত্রকারেরা তাদেরকেও চার-হাতের দেখায়। নারায়ণকে শ্যাম-বর্ণের আর লক্ষ্মীকে গৌর-বর্ণের দেখায় চিত্রে। আচ্ছা, তবে তাদের সন্তান-সন্ততিরা কেমন বর্ণের আর কত হাতধারীই বা হবে ? তবে কি পুত্র সন্তানদের চার-হাত আর কন্যা সন্তানদের দুই-হাত দেখাবে ? এভাবেই তাদেরকেও প্রশ্ন করতে পার। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝায়, সর্বদা এমনই অনুভব করবে যে, স্বয়ং শিববাবা তোমাদেরকে এই মুরলী শোনাচ্ছেন। অবশ্য সেই মুরলীর মধ্যে কখনও কখনও ব্রহ্মাবাবাও কিছু শুনিয়ে থাকেন। শিববাবা তো বলেই থাকেন, উনি গাইড হিসেবেই এসেছেন। এই ব্রহ্মাই ওনার জ্যেষ্ঠ সন্তান। যাকে আবার ত্রিমূর্তি ব্রহ্মাও বলা হয়। অথচ, ত্রিমূর্তি শংকর বা ত্রিমূর্তি বিষ্ণু কিন্তু বলা হয় না। মহাদেব (ব্রহ্মা)-কেও আবার শংকর বলা হয়। তবুও কেন ব্রহ্মাকে 'ত্রিমূর্তি-ব্রহ্মা' বলা হয় ? যেহেতু ব্রহ্মাই প্রজাদের রচনা করেন আবার (প্রজা পালন করে) শিববাবার পত্নীর কাজও করেন। শংকর বা বিষ্ণু এমন কাজ করেন না, অর্থাৎ শিববাবার পত্নীর কাজ করেন না। এটাই খুব মজার ও আশ্চর্যজনক ব্যাপার, যা অতি সূক্ষ্ম-ভাবে অনুধাবন করার।

এখানে বসে কেবল বাবা আর তার আশীর্বাদী-বর্সার কথাই স্মরণ করতে হবে। এটাই যা একটু কষ্টের। বাবার এই জ্ঞান পেয়ে তোমরা বাচ্চারা তো এখন যথেষ্টই বুঝদার হয়েছো। বেহদের বাবার দ্বারা তোমরা বেহদ-রাজ্যের মালিকও হয়ে যাও। এই পৃথিবী, এই আকাশ সবই তখন তোমাদের

অধীনস্ত হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডই হবে তোমাদের করায়ত্ব। অলমাইটি অথরিটি রাজ্য হবে তোমাদের। একটাই গভর্ণমেন্ট থাকবে সেখানে। যখন সূর্যবংশী গভর্ণমেন্ট রাজত্ব করে, তখন চন্দ্রবংশীদের অস্তিত্ব থাকে না। আবার যখন চন্দ্রবংশীরা রাজত্ব করে, তখন কোনও সূর্যবংশীর আর অস্তিত্ব থাকে না। (যেহেতু তখন সেই সূর্যবংশীরাও চন্দ্রবংশীতে পরিণত হয়) সূর্যবংশীরা তখন অতীতের ইতিহাস হয়ে যায়। ড্রামার গতি-প্রকৃতির পরিবর্তন এভাবেই চলতে থাকে। খুবই আশ্চর্যজনক ও মজার কথাও বটে। এসব জেনে বাচ্চাদের মনের আনন্দ কতগুণ বেড়ে যায়। অতএব এমন বেহদের বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা তো অবশ্যই নিতে হবে বাচ্চাদেরকে। জগৎ-সংসারে স্ত্রী-রা তাদের স্বামীকে কতই না স্মরণ করতে থাকে, আর বাবা, ইনি তো বেহদের অমূল্য বাদসাহী দান করেন, অতএব পতিদেরও পতি - এমন পতিকে কত বেশী করে স্মরণ করা উচিত, যেখানে ওনার থেকে এত বিশাল প্রাপ্তি হয়। পরবর্তীতে স্বর্গ-রাজ্যে তোমদের কারও থেকে কোনও প্রকার ভিক্ষা বা সাহায্যও চাইতে হবে না। সেখানে কেউ-ই গরীব থাকে না। বেহদের বাবা ভারতবাসীদের সব কিছুতেই পরিপূর্ণ করে দেন। তাই তো লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বকে স্বর্ণ-যুগ বলা হয়। আর বর্তমানে যে যুগ চলছে, তাকে বলা হয় লৌহ যুগ। এই দুইয়ের মধ্যে কত তফাৎ তা একবার ভেবে দেখ। বাবা জানাচ্ছেন, সেই লক্ষ্যেই তো উনি বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে চলেছেন। তোমরাই একদা দেবী-দেবতা ছিলে। তারপর ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে পরিণত হয়েছ। এখন আবার ব্রাহ্মণ হয়েছো, এরপর দেবতা হবে। তাই এই ৮৪-জন্মের চক্রকে তোমরা নিরন্তর স্মরণ করতে থাকো। চিত্রগুলির দ্বারা খুব সহজ রীতিতেই অন্যদের এসব বোঝানো যায়। দেবী-দেবতাদের রাজত্ব যখন থাকে, তখন আর অন্য কারও রাজত্বই থাকে না। তখন কেবলমাত্র একটাই রাজ্য থাকে ধরায়। যদিও তা আকৃতিতে যথেষ্ট ছোটই থাকে। আর সেই রাজ্যকেই বলা হয় স্বর্গ-রাজ্য। সেখানে যেমন থাকে পবিত্রতা, তেমনই থাকে সুখ-শান্তি। পুনঃজন্ম নিতে নিতে ধীরে ধীরে আবার পতন হতে থাকে। যেসব আত্মারা ৮৪-জন্ম নিয়েছে তাদের আত্মাই এখন তমোপ্রধান অবস্থায় পৌঁছেছে। তাদেরকেই এখন আবার সতোপ্রধান হতে হবে। কিন্তু তারা সতোপ্রধান হবে কিরূপে ? সেই শিক্ষা দেবার জন্য অবশ্যই তেমন কারও প্রয়োজন। অথচ, এক ও একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউ-ই তা শেখাতে পারে না। তোমরা তো এও জেনেছো, এনার (ব্রহ্মাবাবার) অনেক জন্মের শেষে এই অন্তিম জন্মে, শিববাবা এনার শরীরে প্রবেশ করন। কত সহজ-সরল রীতিতে বাবস পরিস্কার ভাবে তোমাদেরকে তা বুঝিয়েও দেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় সন্তানদের তাদের ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এক ও একমাত্র বাবার সাথেই সর্ব প্রকারের ঈশ্বরীয় সম্বন্ধ রাখতে হবে। সেবাধারী বাচ্চাদের কদর করতে হবে। অন্যদেরকেও নিজের মতন করে তৈরী করার সেবা করতে হবে।

২) বেহদের বাবার দ্বারা বেহদ-বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্যের প্রাপ্তি হতে চলেছে আমাদের। ধরিত্রি থেকে আকাশ, সবকিছুই আমাদের অধিকারে থাকবে - এই ঘোরে, আনন্দ ও খুশীতে থাকতে হবে তোমাদের। বাবা এবং ওনার আশীর্বাদী-বর্সাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান :- বুদ্ধিরূপী বিমান দ্বারা সেকেণ্ডেই তিন-লোকে ভ্রমন করতে পারা সহজযোগী হও

বিস্তার :- বাপদাদা ওঁনার বাচ্চাদের নিমন্ত্রণ দিচ্ছেন যাতে বাচ্চারা তাদের সংকল্পের সুইচ অন করলেই বতনে পৌঁছে গিয়ে সূর্যের কিরণ নিতে পারে, চন্দ্রমার পূর্ণিমার আলোও নিতে পারে আর তার সাথে পিকনিক ও খেলাধুলাও করতে পারে। আর এর জন্য দরকার কেবল বুদ্ধিরূপী বিমানে ডবল রিফাইন পেট্রোলের। ডবল রিফাইন অর্থাৎ ১) নিরাকারী নিশ্চয়তার ঘোর - আমি আত্মা, (পরমাত্মা) বাবার বাচ্চা। ২) সাকার রূপে সর্ব সম্বন্ধের ঘোর। এই ঘোরের নেশাই যেমন খুশী সহজযোগী বানিয়ে দেয় তেমনি তিন-লোকের ভ্রমণও করাতে থাকবে।

স্লোগান :- শ্রেষ্ঠ কর্মের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা টানার কলম।